

Barcode - 4990010202521

Title - Shantiniketan vol. 9

Subject - LITERATURE

Author - Tagore, Rabindranath

Language - bengali

Pages - 118

Publication Year - 1908

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4 990010 202521



# শান্তিনিকেতন

(নবম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ১০ আনা ।

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাৰ্লিশিং হাউস

২২, কৰ্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কৰ্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত।

## সূচী

আশ্রম	...	...	১
তপোবন	...	...	২৭
ছুটির পর	...	...	৯৫
বর্তমান যুগ	...	...	১০৩



# শান্তিনিকেতন

## আশ্রম

( শান্তি নিকেতনের বাৎসরিক  
উৎসব উপলক্ষ্যে )

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির  
পদ্মদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্বাটিত করে  
দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার  
জন্মে আজ আমাদের আহ্বান আছে।  
তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে  
সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের  
হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই  
বিষ উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে  
প্রবেশের সহজ অধিকার আছে বার, সেই

## শান্তিনিকেতন

চিন্তামধুকর কি আজও এখনো জাগল না ?  
কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি ?  
আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের  
খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের  
অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে  
দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে,  
দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে,  
তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে  
নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা  
করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন  
আমরা মনে করি, এই গান, এই বাঁধধ্বনি,  
এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা  
ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই !  
কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া  
হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে  
যে নিস্তরক হয়ে আছে সেই পথিকটিকে  
জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব ?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমার বনে ফলভরা

## আশ্রম

শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বহিতে থাকে—  
সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের  
ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে,  
কিসের জন্তে? না, যে বীজ থেকে আমের  
গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে  
এই শুভ খবরটি দেবার জন্তে। বৎসরে বৎসরে  
ফল ধরচে—সে ফলের মধ্যে সেই একই  
বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর  
কিছুতেই ফুরচে না—সে নিত্যকালের পথে  
নিজেকে দ্বিগুণিত চতুগুণিত সহস্রগুণিত  
করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাষৎসরিক উৎসবের  
সফলতার মর্যস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি  
তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ  
অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম-  
বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ।  
মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-

## শান্তিনিকেতন

বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্মে ফল্চে ;  
এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের  
জন্মে ফল্তেই চম্বে ।

বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি  
দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন  
লোকই বা জান্ত ? যারা জেনেছিল যারা  
দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল  
এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই  
এটা শেষ হয়ে গেল ।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই  
সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার  
মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারেনি । সেই  
একটি দিনের মধ্যেই এ'কে কুলিয়ে উঠল না ।  
সেদিন যার খবর কেউ পাননি এবং তারপরে  
বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে  
অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন  
আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল  
প্রসব করচে ।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘটে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কোথাও থাকে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলার পড়ে থাক, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝাঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিশ্বতির মাঝখান থেকে সে আপনার অক্ষুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে—নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর

## শান্তিনিকেতন

ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ষ্য এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও! তাঁর সেই

প্রকাশ যার জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর  
নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে  
আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি  
নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে  
থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে  
সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে।  
সেই জ্ঞেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা  
ঈশানং ভূতভবাস্ত্র ন ততো বিজুগুপ্সতে ।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে,  
এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি  
সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর  
গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ  
একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই  
দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই,  
প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত  
কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের

শান্তিনিকেতন

মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ  
পেতে থাকে ।

এর কারণ কি ? এর কারণ হচ্ছে এই  
যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে  
দেখেছেন । যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা  
অহংকেই বড় করে দেখে । তারা বাহিরের  
দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে । তারা কেবল  
আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি  
আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—  
একেই প্রধান করে দেখে । এই যে অহঙ্কার  
এতে সত্য নেই, নিত্য নেই ; এ আলোকের  
দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না,  
আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে ।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে  
আর অহংয়ের দিকে দৃকৃপাত করতে চায় না ।  
তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই  
হয়ে যায় । যে প্রদীপে আলোকের শিখা  
ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পলুতের

## আশ্রম

সঞ্চয় নিয়ে গর্বি করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে ফিরে তাকায় ? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পলতে উৎসর্গ করে দেয় । কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না ।

ন ততো বিজুগুপ্ততে । কেন ? কেননা তিনি অনুপশ্চতি আত্মানং দেবং । তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন । দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান । আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্য়য় । আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত । অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক । অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে ? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে ।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো

## শান্তিনিকেতন

ভূতভব্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের  
অধিপতি। সেই জগ্ৰেই সে যে সেই বৃহৎ  
কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই  
দেখতে পায়। সে ত কোনো সাময়িক  
আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক  
ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই  
জগ্ৰেই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে—  
তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত  
হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো  
কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের  
আচ্ছাদনকে ধ্বংস করে' আবার নবীনতর  
উজ্জলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার  
দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের  
যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই  
জগ্ৰে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে  
ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে  
সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে

দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তি-  
নিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও  
প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুলে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন  
এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন  
তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা  
এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি  
ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্তে এখানে  
তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু  
ন ততো বিজুগুপসতে। যে জায়গায় বড় এসে  
দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর  
ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন  
পারিবারিক ধনমানসম্মতের মধ্যে ধরে রাখতে  
পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে  
পড়তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও  
তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না—  
এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে  
ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ

## শাস্তিনিকেতন

আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূত-ভবাস্ত্র, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কৰ্ম সমাধা করে তপোবনে ঈশ্বিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে “সর্বভূতেষু চাত্মানং” আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ

হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়ী। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে তুমার যোগ-সাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্তার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব—পরস্পরকে ধর্ষ করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্তু কেবলই ঠেলা-ঠেলি করতে থাকব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শাস্ত্র শিবং অষ্টৈতংক্রমে বিরাজ করচেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্তে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

## শান্তিনিকেতন

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উদ্ভূত হয়ে না ওঠে সে জন্মে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্মে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্তন নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে অসতোমা সদৃগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রাস্তরের মধ্যে তপস্কার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্ত এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতে-

## আশ্রম

ছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রাস্তরের প্রাস্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নিম্নল করে দিচ্ছে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে— তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্তে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্তে দিনে দিনে প্রস্তুত

## শান্তিনিকেতন

হচ্ছে—এবং যে জ্যোতির্শ্বর পরমানন্দ ধারা  
বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-  
ধারায় দিক্‌দ্বিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে  
তারই কাছে নত করে ধরবার জগ্রে তারা  
একটি আহ্বান গুণ্ডতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য-  
ময় সৃষ্টির কাজ চলছে সেই রহস্যটি আমাদের  
মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন  
দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের  
পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে  
দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত  
অতি বিস্তৃত আনন্দ এখানকার নিস্তরু আকা-  
শের মধ্যে নির্মূল ভক্তিরসে সরস একটি  
পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করছে—কেবলি  
বলছে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার  
শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্ছে  
না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে,

সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অব্যাহিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্রামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শাস্তির স্নিগ্ধ অঙ্গন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাথিয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত্ত এখানকার সূর্যোদয়কে, সূর্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রে নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্বাচনীয় ভক্তির সুরে আজও কল্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে

## শান্তিনিকেতন

এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল  
সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন—সেই দিনটি  
আর মরলনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টি-  
শক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আটকা পড়ে  
গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের  
পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে  
লাগল—যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে  
ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি  
প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে  
ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে  
লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ়  
ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা  
এখানকার শালবনের মর্সরে, এখানকার  
আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না ?  
শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি  
ফুলের অল্পস্ব বিকাশের মধ্যে আপনাকে  
প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে  
কিছুতে আর ক্লাস্তি যান্তে চায় না তখন সেই

অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি  
 অপরূপ শুভতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে  
 আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে  
 থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে  
 দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ  
 কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকী-  
 কুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে  
 উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য  
 করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র  
 এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার  
 সুদূরতাকে একটি অনির্কচনীয় বাণীর দ্বারা  
 ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে  
 আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি  
 আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না?  
 একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য,  
 একটা পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল  
 পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত  
 অস্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করচে না?

## শান্তিনিকেতন

নিশ্চয়ই করচে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—বেই এষঃ অশ্রু পরম আনন্দঃ যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং একতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রে নিস্তরু প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সমুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুন্তে পাব না ? কাউকেই কি দেখা যাবে না ? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না ? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিন্তাও

## আশ্রম

ফিরবে, পাষাণ হৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্যালোক নানা প্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করচে যদি গণনা

## শাস্তিনিকেতন

করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকচে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করচে, যা বল্চে “আমি জল,” বলে, আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বল্চে আমি স্থল বলে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি ; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজু-

## আশ্রম

শুপ্ততে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে  
বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য  
প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি  
তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে  
উচ্ছসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপ-  
নিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে  
ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন  
সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে  
তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই  
শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীব-  
নের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে।  
তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা  
নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে  
পারি। তখন তাতে আমাদের মিলে সে  
এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে।  
তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম,  
কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার  
অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে

## শান্তিনিকেতন

ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে ।  
সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়,  
সেই আনন্দ, সেই আনন্দ ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার  
শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার  
আনন্দরূপ দেখতে পাই । তোমার সাধকের  
এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে  
সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের  
সার্থকতা হবে । কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে  
হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না ।  
হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও  
যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ,  
কর্মের যোগ । আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার  
শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার  
অভিপ্রায় । তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা  
করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয় । যে সাধক  
আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং  
পরিপশুতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে ; সে এমনি

## আশ্রম

পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্বী করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কন্ঠে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে

শান্তিনিকেতন

তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ়  
অহৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে  
সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ই পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

—

## তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্বের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি—সেটি সহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বন্ধুরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারচে না।

এই সহরেই মানুষ বিদ্যা শিখে, বিদ্যা প্রয়োগ করচে, ধন জমাচে, ধন খরচ করচে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলচে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুতঃ এছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত আগ্রত

## শান্তিনিকেতন

হয়ে ওঠে—এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে  
প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে  
চিত্তসমুদ্রের মহন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ়  
সার পদার্থ সকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে  
তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে  
আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে  
পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক  
মানুষের অনেক প্রকার উদ্ভম নানা সৃষ্টিকার্যে  
সর্বদাই সচেষ্টিত হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই  
হচ্ছে সহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক  
জায়গায় সহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা  
সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই  
শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তে  
কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ  
একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে।  
কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত্র হবার

একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের  
প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার  
ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভি-  
ব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে ।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য্য  
ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল  
প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে । ভারতবর্ষের  
প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই  
সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি  
করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি ।  
সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে  
মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল ।  
সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলা-  
ঠেলি ছিল না । অথচ এই ফাঁকায় ভারত-  
বর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ  
তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল ।  
এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে  
বলে দেখা যায় না ।

## শান্তিনিকেতন

আমরা এই দেখেছি, যে সব মানুষ অবস্থা-  
গতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা  
বুনো হয়ে ওঠে। হয়, তারা বাঘের মত  
হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মত নির্বোধ  
হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই  
অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত  
করেনি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান  
করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসিনীসহিত সভ্যতার  
ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে  
দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে  
যায়নি।

এই রকমে অরণ্যকদের সাধনা থেকে  
ভারতবর্ষ সভ্যতার যে শক্তি (energy) লাভ  
করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে  
ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে  
জাগেনি এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানতঃ  
বহিরভিমুখী হয়নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের

গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে—নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্মে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয়নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নিৰ্জ্জনবাদী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পসুখদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আৰ্য্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত

## শান্তিনিকেতন

মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাতে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপ-বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারি মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন ; সেইজন্মে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন—“যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং” এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না—তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অব্যাহত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে,

## তপোবন

কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কৰ্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নিজ্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রসবণ এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন—সেইজন্টেই নিশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্টেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে

## শান্তিনিকেতন

আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের  
পাওয়া ।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের  
চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ়-  
প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে ।  
ভারতবর্ষে যে দুই বড় বড় প্রাচীনযুগ চলে  
গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুইযুগকে  
বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে । কেবল বৈদিক  
ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত  
বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজ-  
প্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে  
বুকে করে নিয়েছিল ।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য, সাম্রাজ্য, নগর-  
নগরী স্থাপিত হয়েছে—দেশ বিদেশের সঙ্গে  
তাঁর পণ্য আদানপ্রদান চলেছে—অম্ললোলুপ  
কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে  
দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু সেই  
প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃশ্য ভারতবর্ষ

## তপোবন

বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করেনি। তপস্বীকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে— এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড় বড় রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্তে চেষ্টা করেনি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্য্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি—তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে।

## শান্তিনিকেতন

তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি—তখন, চীন, হুন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে—তখন অনেকের মত রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করচেন, অন্য দিকে দেশ দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্য্যমদগর্ভিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্ত্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখন উদঘাটিত

## তপোবন

হল তখন প্রথমেই তপোবনের শাস্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনাস্তুর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসচেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যাঙ্গমন করচে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মত ; তারা নীবার ধাত্তের অংশ পায় এবং নিঃসঙ্কোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনি-কন্তারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠ্চে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন,—পাখীরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধাত্ত কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা গুয়ে রোমস্থন করচে। আহতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্কশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

## শান্তিনিকেতন

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব ।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করচে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ঐ,—চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য্য ।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখচেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথানত করে প্রণাম করচে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করচে, কুটীরের অঙ্গণে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্তে মেলে দেওয়া আছে ; সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে—বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করচে, অরণ্য-কুকুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহাৰ করচে ;

## তপোবন

নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে  
নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে,—হরিণীরা জিহ্বাপল্লব  
দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করচে ।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ঐ।—  
তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর  
করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরান  
কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে ।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই  
ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয় । মানুষের সঙ্গে  
বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত  
প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিষ্ফুট । যে সকল  
ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে  
থাকে.তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান  
এই জগ্রেই অগ্ৰদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই  
বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা  
করা হয় মাত্র তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা  
দেবার অবকাশ থাকে না । আমাদের দেশের  
প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্য্যন্ত খ্যাতি

## শান্তিনিকেতন

রক্ষা করে আস্চে তাতে দেখতে পাই  
প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে  
বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি  
আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল  
চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।  
মানুষের লোকালয় যদি কেবলি একান্ত মানব-  
ময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি  
কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে  
আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধি-  
গ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে  
আস্বহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি  
আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করচে অথচ  
দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—  
যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর  
সে বেচারী নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—  
এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ  
করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের

সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখ্চে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ তরুণীর যে মিলন সঙ্গীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মত তপস্চার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয়নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝঙ্কত করে তুলেছেন। ধারায়ন্ত্রমুখরিত নিদাঘ-দিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত ; আপকশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী

## শান্তিনিকেতন

তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে  
মদ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল  
কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে  
তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির নাঋখানে সেখানে যার  
স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে  
দেখলে তার অত্যাগ্রতা থাকে না—সেইখান  
থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের  
গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির  
মত অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়।  
শেক্সপিয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নর-  
নারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয় ;—কিন্তু  
সেই সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে  
একান্ত,—তার চারদিকে আর কিছুই স্থান  
নেই ; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির  
যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের  
সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো  
সম্পর্ক নেই—এইজন্তে সেসকল কাব্যে প্রবৃ-

তির উন্নততা অত্যন্ত দুঃস্বরূপে প্রকাশ  
পাচ্ছে ।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের  
আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাক্ষুর উদ্দীপনা  
বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্নততাকে  
একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে  
দেখাবার প্রয়াসমাত্র পাননি । আতসকাচের  
ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্য্যকিরণ সংহত  
হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জলে ওঠে—  
কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র  
স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয়  
বটে কিন্তু দগ্ধ করে না । কালিদাস বসন্ত-  
প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে  
হরপার্বতীর মিলনচাক্ষুরকে নিবিষ্ট করে  
তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন ।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্ব-  
সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে  
বাজাননি ; যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর

শান্তিনিকেতন

ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে  
নিষে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে  
বিস্তারিত ।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব  
কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে  
অঙ্কিত । এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি  
গভীর এবং চিরস্থান কথা । যে পাপ দৈত্য  
প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা  
থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত  
করবার মত বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ  
করে ।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা ।  
প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে  
আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন  
নূতন মূর্তিতে নিজেদের প্রকাশ করে ।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা  
ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল  
তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় ।

## তপোবন

প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম্য বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সঙ্গীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণ-বহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়ে ছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অস্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-

## শান্তিনিকেতন

বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন ?  
হৃদয় ত তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই  
আশ্চর্য্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার  
হতে কেবলি মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে  
ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা  
দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্কার যুগ তখন  
অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্য্যশালী রাজসিংহা-  
সনের পাশে বসে কবি সেই নির্ম্মল সুদূর-  
কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে  
তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরা-  
কালীন সূর্য্যবংশীয় রাজাদের চরিত্রগানে যে  
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই  
বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ  
দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে  
অন্ততঃকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়।

বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যারা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যারা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম্য করতেন, সমুদ্র অবধি যাদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাদের রথবহু; যথাবিধি যারা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যারা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যারা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যারা জাগ্রত হতেন; যারা ত্যাগের জন্তে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যারা সত্যের জন্ত মিতভাষী, যারা যশের জন্ত জয় ইচ্ছা করতেন এবং সম্মানলাভের জন্ত যাদের দারগ্রহণ; শৈশবে যারা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাদের বিষয় সেবা ছিল, বার্দ্ধক্যে যারা মুনি-বৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগাস্তে যাদের

## শাস্তিনিকেতন

দেহত্যাগ হত—আমি বাকসম্পদে দরিদ্র  
হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব,  
কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে  
আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়।  
কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা  
রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যার নামে গৌরবলাভ করেছে  
তাঁর জন্মকাহিনী কি? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্রাত্তেই  
এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজ-  
প্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা  
কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্রার ভিতর  
দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো  
সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব  
পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীর তেজে পরাভূত  
করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করে-  
ছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার

ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী  
সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য  
করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অব্যাহিত প্রবৃত্তির  
যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তা'কে তপস্যার  
অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত  
না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্য  
গৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে  
নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন।  
চতুঃসমুদ্র যার অনন্তশাসনা পৃথিবীর পরিখা  
সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে  
তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের  
আরম্ভ আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-  
ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের  
চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে—কিন্তু  
যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে  
সেও ত কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে

## শান্তিনিকেতন

দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতি-  
প্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নারিকা নিয়ে  
অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের  
সঙ্গে যেন জলন্ত রেখায় বর্ণিত ।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী  
ঋষিবালকের মত পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তা-  
পাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর  
উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের  
অভ্যুদয় বার্তায় জগৎকে উদ্বোধিত করে  
তোলে—কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা  
সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং  
সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা  
করেছিল । আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের  
মধ্যে আবিষ্ট অপরাহু আপনার অদ্ভুত রশ্মি-  
চ্ছটার পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের  
জন্মে প্রগলভ করে তোলে এবং দেখতে  
দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা  
অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই

## তপোবন

বাক্যহীন কৰ্মহীন অচেতন অঙ্ককারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ জ্যোতিষ্কের নির্ঝাপন বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কি, আর হয়েছে কি! সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যাদম তখন তপস্বাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহিঃসহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই ছন্দটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই ছন্দের সমাধান কোথায় কুমারগন্তবে তাই দেখানো

## শান্তিনিকেতন

হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়—আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সঙ্কীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহঙ্কারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড় করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জগুই ত্যাগের প্রয়োজন। এই

ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্তে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্তেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্ত, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্ত, অহঙ্কারকে ত্যাগ প্রেমের জন্ত, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্ত। এই জন্তেই উপনিষদে বলা হয়েছে “তাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ”—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্শ্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ—কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের—কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটেতেই পারে না।

“তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ”—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের

## শান্তিনিকেতন

মর্য়কথা, এবং এইটাই আমাদের তপোবনের  
সাধনা—লাভ করবার জন্তে ত্যাগ  
করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ  
এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য  
আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে  
বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উদ্ভাপ  
যেমন একটি প্রধান জিনিষ, মানুষের জীবন  
গঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড় রাসায়নিক  
শক্তি; এরদ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠি গলে  
যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়।  
অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই  
নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি  
যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই  
দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করচেন।  
ত্যাগকে দুঃখরূপে অস্বীকার করে নেওয়া নয়,  
ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া

## তপোবন

উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সত্ত্বাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। “যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটাই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জগ্গেই তরুণতা পশু-পক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্তদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জগ্গেই আমাদের দেশের কবিষে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্তদেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব

## শান্তিনিকেতন

করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ  
প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্ষরতা  
নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত  
তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে  
থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের  
চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে  
সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-  
জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয়  
হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে,  
তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন,  
তপোবন শাস্তুরসাম্পদ। তপোবনের যে  
একটি বিশেষ রস আছে সেটি শাস্তুরস।  
শাস্তুরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা  
বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি  
চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে  
যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার

## তপোবন

সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে  
তোলে তখনি শাস্তুরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শাস্তুরস। এখানে সূর্য্য  
অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুণতা যুগ পক্ষী  
সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ  
যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুই সঙ্গেই  
মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি  
শাস্তুরসের সঙ্গীত বাঁধা হয়েছিল এই সঙ্গীতের  
আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-  
রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্মেই আমাদের  
কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে  
এত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল  
সম্পূর্ণতার জন্মে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক  
আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ  
করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপো-  
বন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে

## শান্তিনিকেতন

একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশ-সুচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইস্রুদী তৈল মাথিয়ে শুশ্রূষা করছেন ; এই তপোবনটি ছুয়ান্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মত কিম্পুরুষ পর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন,—লতা-জালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্য-জটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে

## তপোবন

ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুঃস্থ তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যালোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া ভালো। এই “যেমন-হওয়া-ভালো”র দিকে “যেমন-হয়ে-থাকে” চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। “যেমন-হয়ে-থাকে” হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর “যেমন-হওয়া-ভালো” হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় হবে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও “যেমন-হয়ে-থাকে” তপস্যার দ্বারা

## শান্তিনিকেতন

অবশেষে “যেমন-হওয়া-ভালো”র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড় হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকুটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ—অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

## তপোবন

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেননি। এই সমস্ত নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল—এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্তেই বনবাসের দুঃথকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তি দ্বারা কীর্ত্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য্য যাঁদের অস্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না।

## শাস্তিনিকেতন

সমাজপত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস  
পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে  
না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে  
তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্য্যে পালিত কিন্তু  
ঐশ্বর্য্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত  
করেনি। ধর্ম্মের অমুরোধে বনবাস স্বীকার  
করাই তাঁর প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন  
ছিল, শাস্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে  
প্রবাসস্থঃখ ভোগ করেনি; এইজন্যেই  
তরুলতা পল্লপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলি  
আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভূষের  
আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের  
আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্শ্রা,  
আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই  
বাণী, তেন ত্যাস্কেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধু সীতা বনে  
চলেছেন—

## তপোবন

একৈকং পাদপংগুলাং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্  
অদৃষ্টে রূপাং পশুস্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা ।  
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্  
সীতাবচনসংরক্ত আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ।  
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্ ।  
য়েষে জনকরাজশ্চ সূতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্ ।

যে সকল তরুগুলু কিম্বা পুষ্পশালিনী লতা  
সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা  
তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন । লক্ষ্মণ  
তাঁর অসুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা  
বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন ।  
সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা  
নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন ।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন  
আশ্রয় গ্রহণ করলেন—তিনি

সুরম্যমাসাচ্চ তু চিত্রকূটং  
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সূতীর্ষাং  
মনন্দ কুটৌ বৃগপক্ষিজুষ্টাং  
অহৌ চ হৃৎখং পুরবিপ্রবাসাং ।

শান্তিনিকেতন

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মালা-  
বতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে  
প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের হুঃখকে ত্যাগ করে  
হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন ।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে  
বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর  
দেখিয়ে বল্চেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাশ্ববঃ

মনো মে বাধতে দৃষ্টে। রমণীয়মিমং গিরিম্ ।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও  
আমাকে হুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদগণের কাছ থেকে  
দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না ।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে  
গেলেন সেখানে গগনে সূর্য্যমণ্ডলের মত দুর্দর্শ  
প্রদীপ্ত তাপসাত্মমণ্ডল দেখতে পেলেন । এই  
আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্ । ইহা ব্রাহ্মীশাস্ত্রী

দ্বারা সমাবৃত। কুটারগুলি সুমার্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—  
কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র  
তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি  
রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতি-  
ফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন  
করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল  
নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত  
হয়েছিলেন। এইজন্ম সীতাহরণের পর রাম  
সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার  
সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল  
রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে  
হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে  
অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি  
হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার  
পল্লবঘনশ্রামলতাকে, তার ছায়াগন্তীর গহন-

## শান্তিনিকেতন

তার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে  
রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্সপীয়রের *As you like it* নাটক  
একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেষ্ট্‌ও তাই,  
*Midsummer night's dream*ও অরণ্যের  
কাব্য। কিন্তু সেসকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব  
ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের  
সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাইনে। অরণ্য-  
বাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন  
ঘটেনি—হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে  
ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে,—হয়  
বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের  
প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেচুঁলে স্বতন্ত্র হয়ে  
উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের *প্যারাডাইস্ লষ্ট্* কাব্যে আদি  
মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন  
যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে  
প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সঘনকে বিরাট ও

## তপোবন

মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা । কবি প্রকৃতি-  
সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে  
হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করচে তাও  
বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো  
সাহিত্যিক সম্বন্ধ নেই । তারা মানুষের ভোগের  
জন্মেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু ।  
এমন আভাসটি কোথাও পাইনে যে এই আদি  
দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা  
পশুপক্ষীর সেবা করচেন, ভাবনাকে কল্পনাকে  
নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত  
করে তুলচেন । এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত  
নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম  
করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or  
worm durst enter none ; such was  
their awe of man." অর্থাৎ পশু পক্ষী  
কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত  
না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সত্তর  
সম্মম ছিল ।

## শান্তিনিকেতন

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে "ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে—এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীৰ্ত্তন করবার জন্তেই ; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্তে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে ! সে মিলন মৃত্যুর মিলন নয় সে মিলন

চিত্তের মিলন, স্মৃতির আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীৰ্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্য্যাবেগে চারিদিকের জল-স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন “যত্র ক্রমা অপি যুগা অপি বন্ধবো মে” তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে সকল গাছ পাখী ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষণগলার মত গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিয়হ নিজের ছুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করচে না। বিরহ-ছুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যানগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়-

## শান্তিনিকেতন

বেদনাকে কবি সঙ্কীর্ণ করে দেখান নি, তাকে  
বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন ; এই জগত্ই  
প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চির-  
কালের মত বর্ষাঋতুর গর্ভস্থান অধিকার করে'  
প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসঙ্গীতের রূপদে  
এমন করে বেঁধে দিয়েছে ।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব । তপ-  
স্কার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়-  
বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই ।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ব উপলব্ধি  
করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর এক, মিল-  
নের মধ্যে । এক, ভোগের দ্বারা, আর এক,  
যোগের দ্বারা ; ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের  
পথ অবলম্বন করেছে । এই জগত্ই দেখতে  
পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ  
সৌন্দর্য্য বা মহিমার আবির্ভাব সেই খানেই  
ভারতবর্ষের তীর্থস্থান । মানবচিত্তের সঙ্গে  
বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে

## তপোবন

পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই—এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না—এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অমৃত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়—এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে' আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে এই জন্মেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিজ্জ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয় সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তম্ভ দান করে আস্চে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ

## শান্তিনিকেতন

বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস  
সরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে  
যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার  
অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা  
মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার  
চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার  
সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলেছে, যার  
জলে তার অভিষেক, যার অন্তরে তার জীবন,  
যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার  
দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে  
ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত  
করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির  
মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত  
করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে  
ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে  
কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করেনি—  
তাকে ঔদাসীণ্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের  
বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়নি ; এই বিশ্ব-

প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ  
আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে,  
ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই  
ঘোষণা করচে।

বিদ্যালভ করা কেবল বিদ্যালয়ের  
উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের  
উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে  
যায়, এমন কি, উপাধিও পায় অথচ বিদ্যা পায়  
না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু  
তীর্থের ষথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে  
না। যারা দেখবার জিনিষকে দেখবে না,  
পাবার জিনিষকে নেবেনা, শেষ পর্য্যন্তই তাদের  
বিদ্যা পুঁথিগত ও ধন্য বাহ্য আচারে আবদ্ধ  
থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই  
তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা  
বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ  
আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য  
ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে

## শান্তিনিকেতন

নির্ধাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরস্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটি সংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদগতি ঘটান সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড় জিনিষ বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্ত তরল পদার্থ বলে

## তপোবন

সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জগ্বে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জগ্বে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে—যে লোক চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে

## শান্তিনিকেতন

পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমির সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধ শক্তি স্বীকার করতে পারে সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অনুরূপে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মুঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রেরণ হয় না ; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা—তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মুঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবল ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে একথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া

যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনি  
যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ  
করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্তে নয়,  
নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপ-  
দিষ্ট পুণ্যলাভের জন্তে নয়—তার একমাত্র  
উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের  
সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে  
যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার  
জ্বনিষ বলে দেখি তবে কখনই তাকে  
সত্যরূপে দেখতে পারিনি—তবে প্রাণ  
জ্বনিষটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত  
হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়,  
শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ  
হয়ে ওঠে—এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে  
জলে স্থলে আকাশে গুহার গহ্বরে দেশে  
বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

## শান্তিনিকেতন

এই যোগব্রহ্মতা, এই বোধশক্তির অসাড়াতা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্তে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্ধিততা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কি ? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল — সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্তেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান, অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে—এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়—বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,

মনসস্ত পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্ত সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয় সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়—কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর—কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময়

## শান্তিনিকেতন

যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের  
দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই  
উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ !

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই  
বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের  
সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের  
এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর  
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা  
মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের  
শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের  
শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান  
দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-  
শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাস করা  
নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—  
প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা  
পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে

## তপোবন

কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা ।  
বোধের তপস্যা নয় ।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয় । যে সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয় । যা নিকটে আছে বলে বড় এবং দূরে আছে বলে ছোট, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক তাকে তার বাধার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয় ।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপূর বাধা । প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায় । কামনার জিনিষকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিষটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই ; লোভের জিনিষকে আমরা বড় দেখি

## শান্তিনিকেতন

সে জিনিষটা সত্যই বড় বলে নয় আমাদের  
লোভ আছে বলেই ।

এইজন্তে ব্রহ্মচর্যের সংঘের দ্বারা বোধ-  
শক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া  
আবশ্যক—ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে  
অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক  
উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুদ্র এবং বিচার-  
বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যহীন করে দেয় তার ধাক্কা থেকে  
বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয় ।

যেখানে সাধনা চল্চে, যেখানে জীবনযাত্রা  
সরল ও নির্যমল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের  
সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত  
বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেই  
খানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা  
বলেছে তাই লাভ করবার স্থান ।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ  
একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের  
ছুরাশা মাত্র । কিন্তু সে আমি কোনোমতেই

## তপোবন

স্বীকার করতে পারিনে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়—সেই জন্মেই তার সাধন চাই। আসলে, প্রথম শত্রু হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিষটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করিনে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি—তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশেব সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম

## শাস্তিনিকেতন

তপস্কার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতর আশা করিনে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্তে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অস্তুত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উর্দ্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

শ্রাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে যুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতাস্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যাগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে শ্রাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা

## তপোবন

করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—  
ভূমৈব সুখং, নামে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব  
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের  
জাতীয়তার মন্ত্র ।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার  
বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং  
সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের  
নানাদিক্কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই  
ছিল আমাদের ঞ্চাশনাল সাধনা । সেই সাধনা  
যোগসাধনা । যোগসাধনা কোনো উৎকট  
শারীরিক মানসিক ব্যায়াম চর্চা নয় । যোগ-  
সাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা  
করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে  
ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা  
পরিপূর্ণ হয়ে উঠাকেই আমরা চরম পরিণাম  
বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়  
আত্মাকে সত্যো উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা  
বলে স্বীকার করি ।

## শাস্তিনিকেতন

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসকুল ভারতবর্ষে আমাদের আৰ্য্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে যুরোপীয়-দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্য সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ড সকলকে অনুবর্তীদের জন্তে অমুকুল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয়নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্বী হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড় বড় সহর

## তপোবন

ইন্দ্রজালের মত ভেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে সহরের সৃষ্টি হয়নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয়নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্ষের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠেনি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই অরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয়নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড় জিনিষ কিছুই দেয়নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড় পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করেনি

## শান্তিনিকেতন

তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয়নি । নগর নগরাই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অলভেদী করে প্রচার করেছে ; আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন ; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে ।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি । আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই । সে তাল গাছের মত একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মত অসংখ্য ডালে পালায় আপনাকে চারদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয় ।

## তপোবন

তার যে শাখাটি যেকিকে সহজে যেতে পারে  
তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে  
দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা  
লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে  
মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ়  
প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের  
মত ছাঁচে ঢালবার জিনিষ নয়। বাজারে  
কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার  
মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত  
মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে  
ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদারকে খুসি করে  
দেবার ছরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোট পা সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ,  
এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সঙ্কুচিত  
করে চীনের মেয়ে ছোট পা পায়নি, বিকৃত  
পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি  
দ্বারা নিজেকে যুরোপীয় আদর্শের অনুগত

## শাস্তিনিকেতন

করতে গেলে প্রকৃত যুরোপ হবে না বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

একথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিষের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিষটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে, যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ

## তপোবন

আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিগ্ৰহী নয়, স্বাৰাজ্য নয়, স্বাদোশকতা নয় ; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারত-বর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতার ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সৰ্ব্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্তে তপস্বী করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অস্তুরের মধ্যে যে উদার তপস্বী গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্বী আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা

## শান্তিনিকেতন

করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাঙ্ঘিক-  
ভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে  
ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান  
সহিতে হবে, ততদিন নানাদিক্ থেকে আমাদের  
বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্যা, ব্রহ্মজ্ঞান,  
সর্বস্বীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন  
এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল  
মতবাদরূপে ছিলনা; প্রত্যেকের জীবনের  
মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জগ্বে  
অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ  
যদি আমরা বিশ্বৃত না হই, আমাদের সমস্ত  
শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত  
করি—তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে  
আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো  
সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধী-  
নতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই।  
সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে

## তপোবন

স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড় মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে—এই যোগ অহঙ্কারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্কল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি—এই জগ্গেই ঝড় চিরদিন টিকতে পারে না, এই জগ্গেই ঝড় কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জগ্গ ক্ষুদ্র করে—আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না,

শান্তিনিকেতন

আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন  
করে। এই জন্মেই ভগবান যিশু বলেছেন  
যে, যে বিনম্র সেই পৃথিবিজম্মী, শ্রেষ্ঠধনের  
অধিকার একমাত্র তারই।

---

# ছুটির পর ।

( শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে )

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কৰ্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কৰ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্ত নয়—কৰ্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কৰ্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কৰ্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারিনে। অবিশ্রাম কৰ্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কৰ্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কৰ্ম তখন মাকড়সার জালের মত আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকেনা। এই জন্ত অভ্যস্ত কৰ্মকে পুনরায়

## শান্তিনিকেতন

নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই  
এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই।  
কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই  
তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখবনা।  
কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের  
প্রথর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে  
আমরা এই সংসার কারখানার মুটেমজুরের  
মতই সর্বান্তে কালিবুল মেখে দিন কাটিয়ে  
দেবনা ; একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড়  
ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে  
পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের  
যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত  
এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ  
জন্মে। নতুবা কেবলি কলের চাকা চালাতে  
চালাতে আমরাও কলেরই সামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের  
কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছি। এবার কি আবার

## ছুটির পর

নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না ? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাস বশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না ?

এ আনন্দ किसের জন্তে ? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে ? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি ? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্ভানুভবের আনন্দ ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তাহার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ভ উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিষটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহঙ্কার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিছারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের

## শান্তিনিকেতন

আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল  
লৌহময় কলের আফালনকে দেখি না।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি  
মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল  
একটি মঙ্গলের কল মাত্র? কেবল নিয়ম  
রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা  
শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং  
খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল  
তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম?  
তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড় করে দেখা, এই চেষ্টার  
ফলকেই বড় ফল বলে গর্ব করা সে নিতাস্তই  
ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ  
হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র।  
আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্মের মধ্যে  
মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট  
হয়ে উঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে  
দেখি তবে মঙ্গল কর্মের উপরে সেই বিশ্ব-

## ছুটির পর

মঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কৰ্ম্ম সেই বিশ্ব-কৰ্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না—নিরুদ্বম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জগুই কৰ্ম্ম—নহলে কৰ্ম্মের মধ্যেই কৰ্ম্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কৰ্ম্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকৰ্ম্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তা হলে কৰ্ম্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কৰ্ম্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে—কারণ, কৰ্ম্মফলের চেয়ে আরো যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম

## শান্তিনিকেতন

করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর  
বাঁধলে চলবে না—বস্তুত কৃতকার্য হব কি  
না তা জানি নে—কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত  
সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের  
বাধা ক্ষয় হয়—তাতে আমাদের তেজ ভস্ম-  
মুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং  
সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার  
চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে।  
আনন্দিত হও, যে, কর্মে বাধা আছে—  
আনন্দিত হও, যে, কর্ম করতে গেলেই  
তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সহিতে  
হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারম্বার  
তার পরাভব ঘটবে, আনন্দিত হও যে, লোকে  
তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে—  
আনন্দিত হও, যে, তুমি যে বেতনটি পাবে  
বলে লোভ করে বসেছিলে বারম্বার তা হতে  
বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই ত সাধনা।  
যে ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে ব্যক্তির

## ছুটির পর

কাঠ পুড়ছে বলে হুঃখ করলে চলবে কেন ?  
যে কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে  
তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও ! তাই  
ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত  
অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে  
প্রবেশ করছি । কাকে দেখে ? যিনি কর্মের  
উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে ।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে  
অথচ উগ্রতা চলে যায় । চেষ্টার চেষ্টারূপ  
আর দেখতে পাই নে, তার শাস্তিমূর্তিই ব্যক্ত  
হয় । কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা  
আসে — ভরা ঞ্জয়ারের জলের মত সমস্ত  
থম্‌থম্‌ করতে থাকে । ডাকাডাকি হাঁকা-  
হাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে  
যায় । চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছু-  
মাত্র থাকে না । শক্তি তখন আপনাকে  
আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে  
—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকালের

## শান্তিনিকেতন

নক্ষত্রমণ্ডলী ! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল  
গতি, তার ভয়ঙ্কর উদ্যম কি পরিপূর্ণ শান্তির  
ছবি বিস্তার করে কি কমনীয় হাসিই  
হাসছে ! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে  
পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহামুন্দর রূপ  
দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব—কর্মের  
উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্য্যে মগ্নিত করে  
আচ্ছন্ন করে দেব—আমাদের কর্ম, মধু স্তোঃ,  
মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই  
সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে ।

---

## বর্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল, এর অভ্যন্তরে কি প্রচুর আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্ব-মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ আগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্ত সকল প্রকার অন্তায়কে চূর্ণ করবার জন্ত মানব মাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত

## শান্তিনিকেতন

এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে  
শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে, নব পল্লবে সেজে ওঠে,  
মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ার  
ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জ্ঞান ব্যাকুল।  
মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আশ্বাদ পেয়েছে,  
একে এখন কোনমতেই বাইরের শক্তির  
দ্বারা চেপে ছোট করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিষটা সহসা আমাদের চোখে  
পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার  
অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে বসি।  
আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে  
একটা ভূমূল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে  
আমরা পলিটিক্‌স (Politics) বলি।  
তাকে যত বড় করেই দেখি না কেন, সে  
নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। আমাদের  
আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করচে  
সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই  
নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে

## বর্তমান যুগ

কাজ করতে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়তে না ; পলিটিক্‌সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে । আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না । কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এইত বিংশ শতাব্দীর বার্তা । বিশ্বাস কর, অনুভব কর, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে । পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না । আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন ? তন্দ্রা কি ছুটবে না ? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোট বড় যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে । পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার

## শান্তিনিকেতন

পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তাহা কল্যাণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই সুভোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোল। প্রস্তরের উপর দিয়ে জল-স্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোন ছোট বড় সাধনার কেন্দ্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হোক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে

## বর্তমান যুগ

দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা ঘেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করে ফুটবল খেলে এতবড় একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনই না—এ হতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্কার দ্বারা সূন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠ। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হোক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধূলা পড়া গুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভাল করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখ। বর্তমান কালের একটি সুবিধা এই—বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে

## শান্তিনিকেতন

একই সময়ে সকল দেশের লোক তাহা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেবা তার কোনই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়া পৌছবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোন স্থানে যা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানা দিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা সুর্যোগ। এমন দিনে আশ্রম বাসের সুর্যোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—

## বর্তমান যুগ

ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে।  
সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত  
ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব  
হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে।  
ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ  
ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে  
উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষ-  
শুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা  
তুলে ধরছিল, তখনও এই নূতন যুগের  
কোনই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছায় নি।  
অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্ম  
আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ;  
তখনও বিশ্ব মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নি,  
শব্দ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর  
জন্ম বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে  
এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তাহার  
লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা

## শান্তিনিকেতন

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হল—আমাদের  
কি পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্ব দেবতাকে  
দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে  
কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব ;  
এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—  
শতাব্দী-ব্যাপী-উৎসব। এই উৎসব কোন  
বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—  
এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-  
জোড়া উৎসব। এস, আমরা সকলে একত্র  
হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোন রাজার  
যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য  
যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন  
জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন  
বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের  
রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে  
দাঁড়িয়েছেন, নত কর উদ্ধত মস্তক। দূর কর  
সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুদ্ধ  
করে তোল। শান্ত হও, পবিত্র হও।

## বর্তমান যুগ

তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফের। তিনি  
তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—  
মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

---



